শিবনারায়ণ রায় : রাজনীতি জিজ্ঞাসা

স্বরাজ সেনগুপ্ত

শিবনারায়ণ রায় রাজনীতি-সচেতন, রাজনীতির চর্চায় তাঁর ক্লান্তি বা অনীহা কোনেটিই নেই। রাজনীতি বিষয়ে তাঁর লেখার পরিমাণও নেহাত কম নয়। গভীর মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি মার্ক্স এবং নানা দেশের মার্ক্সবাদী ভাবুকদের রচনা পড়েছেন, গান্ধীদর্শন বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্বখ্যাত বই Gandhi, India and The World-এর সম্পাদনা করেছেন, মৌমাছিতন্ত্র-এর মতো বই লিখেছেন। এই শেষে বইটি আমার মতো অনেক র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টের কাছে তো বটেই মুক্তবুদ্ধি, স্বাধীনচিত্ত যে কোনো মানুষকেই উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তবে একথাও ঠিক শিবনারায়ণের রাজনীতি ভাবনার স্তরটিকে এদেশের, না শুধু এদেশের কেন, কোনো দেশেরই প্রচলিত রাজনীতির জগতেই দেখতে পাওয়া যাবে না। তাঁর রাজনীতি-সচেতনতা, অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও তথ্যজ্ঞান, তাঁর অকৃত্রিম নিষ্ঠা, প্রখর জিজ্ঞাসা ও সন্ধিৎসার চিরস্থায়ী পরিচয় তিনি রেখেছেন মানবেন্দ্রনাথের রচনাবলীর সম্পাদনায়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে যার চার খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই সম্পাদনার বিরাট দায়িত্ব-পালন যে-কোনো মহৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও উপলব্ধি খুব উঁচুমানের বলেই এ দায়িত্ব-পালনে তিনি উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। এ কালের কথা জানি না, ভাবীকালের এদেশের রাজনীতি-চর্চার ইতিহাসে শুধু এই একটি বিরাট কর্মসাফল্যে শিবনারায়ণ নিশ্চয় স্মরণীয় হবেন।

দুই

শিবনারায়ণের রাজনীতি অথবা তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও উপলব্ধির জগৎটাকে বুঝতে চাইলে মানবেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রদর্শন অতি সংক্ষেপে হলেও আমাদের কিছুটা বোঝা দরকার। আমরা জানি, শিবনারায়ণের ভাবনা-চিন্তার জগতে ডারউইন, মার্ক্স, ফ্রয়েড, রাসেল, সার্ত্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু ভাবুক ও মনীষীরাই উপস্থিত আছেন। এঁদের কাছে তিনি ঋণী, এ ঋণ তিনি স্বীকারও করেছেন। কিন্তু একথা সত্য, তাঁর ভাবনাচিন্তার পূর্ণতা ও পরিণতি সৃষ্টিতে বিপ্লবী-দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথের প্রভাব সর্বাধিক। এই বিরাট পুরুষটির বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তাঁর সমাজ ও ইতিহাসের প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণ, তার বিশ্ববিদ্যার অনুশীলন ও বিস্ময়কর আত্তীকরণ ক্ষমতা, ইওরোপীয় রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও তার শাশ্বত মূল্য নির্ণয়ে তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টিপাত এবং তাঁর অপরাজেয় স্বাধীন দৃষ্টি-ব্যক্তিত্ব, তাঁর মৌলিক প্রতিভা ও চিন্তাশক্তি শিবনারায়ণের মতো মুক্তবুদ্ধি মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করেছে এবং গভীরভাবে প্রভাবিতও করেছে। মানবেন্দ্রনাথের জীবন ও দর্শন সংক্ষেপে আলোচনা করে অথবা বিচার-বিশ্লেষণ করে তার রাষ্ট্রদর্শনের সারমর্ম বোধগম্য করে তোলা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ, আমার নিজের কাছে তো দুঃসাধ্য বলেই মনে হয়। সে দুঃসাধ্য পথে না গিয়ে শিবনারায়ণের দৃষ্টির দর্পণে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর জীবন ও রাষ্ট্র দর্শন নিয়ে কতটা উদ্ভাসিত হয়েছেন তা বোধহয় সহজে বুঝে নিতে পারি। এবং এভাবে বুঝলেও মানবেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রদর্শনের প্রধান সূত্রগুলির নিষ্কর্ষ আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

শিবনারায়ণের ভাষায়— ‘‘এই দর্শন অনুসারে স্বাধীনতার ক্ষুধা এবং সত্যসন্ধিৎসা, মানুষী অস্তিত্বের প্রাজাতিক এবং সে কারণে অবিচ্ছেদ্য বৃত্তি; পোষণ এবং অনুশীলনের দ্বারা মানুষ আত্ম-নির্মাণে এবং ইতিহাস রচনায় সক্ষম হয়। এই সামর্থ্যের বাস্তবায়নই প্রগতির একমাত্র নির্ভরযোগ্য নির্ণায়ক। কোনও সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিধিব্যবস্থা, সংগঠন প্রতিষ্ঠান মানুষের প্রাতিস্বিক বিকাশের পক্ষে কতটা সহায়ক তার বিচারের দ্বারাই তার মূল্যদান সঙ্গত।” (সাপ্তাহিক বর্তমান, মে ১৬, ১৯৯২ : রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, মানবেন্দ্রনাথ)।

মানবেন্দ্রনাথের এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে শিবনারায়ণ সহবোধে ও সহমতে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত— আধুনিক সভ্যতার মহাসঙ্কটে বিশ্বব্যাপী এক নূতন রেনেসাঁস না ঘটলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। সত্যার্থবহ বিজ্ঞানসম্মত রাষ্ট্র-দর্শন গড়ে উঠতে পারে ব্যক্তি-মানুষের মুক্তিস্পৃহা এবং সত্যসন্ধিৎসা, স্বনির্ভরতা এবং সহযোগ, ধর্মীয় সংস্কার এবং জাতিপ্রেমের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক দার্শনিকতা, নৈতিকতা এবং বিশ্বমনবতাবোধের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে। মুখ্যত এই সিদ্ধান্ত, যাকে তিনি মনে করেন একটি অভিনব দার্শনিক উপলব্ধি ও উত্তরণ, মেনে নিয়েই শিবনরায়ণের রাজনীতিচর্চা, তাঁর বিশ্বরাজনীতির বিচার-বিশ্লেষণ। এই প্রসঙ্গে তাঁর A New Renaissance এবং The Spirit of the Renaissance বই দুটি অবশ্যপাঠ্য।

তিনি

আমার মতো, ইংরেজি -বাংলায় শিবনারায়ণের রাজনীতিবিষয়ক অসংখ্য নিবন্ধ-প্রবন্ধের কথা মনে রেখেই বলছি, মৌমাছিতন্ত্র বইটি তাঁর রাজনীতি চর্চার শ্রেষ্ঠ ফসল। এই বইটির পরিচয় দেবার আগে শিবনারায়ণের বৃহত্তর বিচরণভূমি সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার মনে করি। সাহিত্য - শিল্পের জগতে বিচরণেই তিনি অনেক বেশি আনন্দ পান, তিনি নিজেও বোধহয় মনে করেন, এই তাঁর স্ব-ভূমি। তিনি রাজনীতি - সচেতন, কিন্তু রাজনীতি সংলগ্ন নন। বিশ্ব সাহিত্যের অথবা শিল্প-জগতের এমন কোনো স্মরণীয় স্রষ্টা নেই যাঁর সৃষ্টির সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন তিনি

করেন নি। শেকসপীয়র, মিলটন, গ্যেটে, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল থেকে আধুনিক কালের এলিয়ট, অডেন, স্পেন্ডার, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব, সুভাষ, শঙ্খ, শক্তি পর্যন্ত কেউ তাঁর তীক্ষ্ণ অথচ গভীর দৃষ্টির ও বিচার-পরিধির বাইরে ছিলেন না। তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন টমাস মান, সার্ত্র, কাম্যুর সৃষ্টিলোকে, আবার ব্যতিক্রমী বিরল রসবোধে বিচার করেন শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ বহুক্ষেত্রেই আবিষ্কার, আমরা নতুনভাবে তাঁদের দেখতে পাই। ইউরোপীয় এবং এদেশীয় চিত্রশিল্প, বিশেষ করে আধুনিক চিত্রশিল্প সহজেই তাঁর বুদ্ধিগোচর হয়ে ওঠে। সম্ভাবনাময় তরুণ কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিকদের প্রতি তাঁর সহৃদয় মনোভাব তো সুবিদিত। জিজ্ঞাসা-র বহু তরুণ কবি ও গল্প লেখক তাঁর এই সহৃদয়তার সাক্ষী। তরুণ কবিদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত অনেক সময়ে অনেকের ক্ষোভেরও কারণ হয়েছে। কিন্তু যে কথাটি এখানে আমি বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই তা হল— শিবনারায়ণকে ঘিরে সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্য সমালোচনার একটি স্বতন্ত্র বৃত্ত গড়ে উঠেছে। এই বৃত্তটির কোনো দিকে কোনো দেওয়াল নেই, সব দরজা-জানলা খোলা। কোনো বাঁধা ধরা তত্ত্ব বা মতাদর্শের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এখানে দাবি করা হয় না। এখানে যে-কোনো মুক্তবুদ্ধি মেধা ও সৃজন ক্ষমতাই তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা পায়।

শিবনারায়ণের এই মুক্তবুদ্ধি, মননশীলতা ও বিচারক্ষমতা অনুস্যূত আছে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনায়। তিনি একদা দেশ সাহিত্য সাপ্তাহিকে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ— 'গ্যোয়েটে ও রবীন্দ্রনাথ' লিখে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানেও গ্যোয়েটে ও রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক মূল্যায়নে গুরুত্ব দিয়েছিলেন ব্যক্তির স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্বের স্বাধীন ও সার্বিক বিকাশকে। তিনি লিখেছিলেন— ''কোনো মানুষই যে সামান্য নয়, প্রতি মানুষেরই মধ্যেই যে অক্ষয় সম্পদের সম্ভাবনা নিহিত আছে এবং সেই সম্ভাবনা বিষয়ে সচেতন হওয়ার দ্বারাই মানুষ আপনাকে নানারূপে প্রকাশ করেছেন।'' আমাদের কালের যুক্তি ও বিজ্ঞান-নির্ভর এই মানবতন্ত্রই (এদেশে মানবেন্দ্রনাথ যাকে Radical Humanism বা New Humanism নামে গড়ে তুলেছেন) শিবনারায়ণের রাজনীতি এবং সাহিত্যনীতি। মুক্তবুদ্ধি রাজনীতি ও উদার সাহিত্যনীতির এমন নিবিড় আত্তীকরণ এদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায় না। তাঁর স্রোতের বিরুদ্ধে এবং খাড়াইয়ের দিকে বই দুটি পড়লেই আমরা বুঝি, বামনবুদ্ধি বা জড়বুদ্ধিকে কঠিন আঘাত করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। সমাজের অধিকাংশ মানুষ যখন যুক্তিবুদ্ধি, বিচার- বিবেকের নির্দেশে না চলে সংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধি ও বিশ্বাসের স্রোতে গা ভাসায়, কোনো না কোনো কর্তার কাছে বাধ্য বা অনুগত থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, সেই সমাজ নতুন নতুন ভাবনাচিন্তা ও সৃষ্টির বৈচিত্র্যে চলমান হতে পারে না, জড়তাই তাকে পাথর চাপা দিয়ে মারে। বিচারহীন আনুগত্যের অভ্যাসে মানুষের চিন্তাশক্তি লুপ্ত হয়; অপহৃত হয়, বলা যায়। এই মানুষ মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। স্রোতের বিরুদ্ধে খাড়াইয়ের দিকে চলবার সাহস ও প্রতিজ্ঞা না থাকলে মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না, হতে পারে না। শিবনারায়ণ যুবক বয়সে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাসূত্রে যুক্ত হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত স্রোতের বিরুদ্ধেই চলতে চলতে শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলনে একটি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

চার

এবার ফিরে আসি তাঁর মৌমাছিতন্ত্র-এ। 'মৌমাছিতন্ত্র' নামটি রবীন্দ্রনাথের কালান্তর থেকে সংগৃহীত। বইটিতে প্রবন্ধ সংখ্যা চার— মৌমাছিতন্ত্র, উদারতন্ত্রের অবক্ষয়, গণতন্ত্র, ও সংস্কৃতি এবং চার্চ, রেনেসাঁস ও মানবতন্ত্র। প্রথম প্রবন্ধ 'মৌমাছিতন্ত্রে'র শিরোভাগে শিবনারায়ণ রবীন্দ্রনাথের যে মূল্যবান রচনাংশ উদ্ধৃত করেছেন প্রবন্ধটির সারকথা বুঝতে তা সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— ''লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে মৌমাছি যে-চাক তৈরি করে আসছে সেই চাক তৈরি করার একটানা ঝোঁক কিছুতেই সে কাটিয়ে বেরুতে পারছে না। এতে করে তাদের চাকের নিখুঁত মতো তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ এই চিরাভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে বন্ধ হয়ে আছে, সে আপনাকে নানাদিকে মেলে দিতে পারছে না। এদেশের রবীন্দ্রভক্ত বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় রচনা মন দিয়ে পড়ে না। পড়লেও অনুধাবন করেন না। যদি পড়তেন এবং অনুধাবন করতেন তাহলে আমাদের চারপাশে এমন বামনবুদ্ধির আধিপত্য দেখা দিত না। মানবেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রভাবনা ও দর্শনচিন্তার সারকথাও এখানে রবীন্দ্রনাথের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। আমার মনে হয়, বিশ শতকের এই বিশ্বসচেতন ভাবুকের নানা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে, সমধর্মিতা 'মৌমাছিতন্ত্র' মতো প্রবন্ধ রচনায় শিবনারায়ণকে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু তাঁর 'মৌমাছিতন্ত্র' রবীন্দ্রনাথ অথবা মানবেন্দ্রনাথের নিছক অনুবর্তন নয়, তাঁর স্বাধীন মৌলিক চিন্তার অনুলব্ধ উত্তরণও নিশ্চয়।

প্রবন্ধের শুরুতেই শিবনারায়ণ ফরাসী দার্শনিক রুশোর এই মতাদর্শকে আক্রমণ করেছেন— মানুষের যত বিকৃতি, তার মূল কারণই হল শিল্প, সাহিত্য আর বিজ্ঞান। আদিম মানুষই স্বাধীন মানুষ; সংস্কৃতির মধ্যে সে স্বাধীনতার বিকাশ নয়, বিনাশ ঘটে— (এ কালের উত্তর - আধুনিকতার [Post-modernism] প্রবক্তাদের মধ্যেও কেউ কেউ এসব কথা বলেছেন।)। শিবনারায়ণ দেখিয়েছেন, পৃথিবীর যে-সব দেশেই স্বাধীনচিন্তা নিষিদ্ধ হয়েছে, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, সে-সব দেশে ব্যবহারিক জীবনে ব্যক্তিকে গ্রাস করেছে কর্তা অথবা গুরু-শাসিত

সমাজ। ব্যক্তি তার স্বভাবে, সংস্কারে হয়ে উঠল মৌমাছি। কিন্তু প্রাচীনকালের এই মৌমাছিতন্ত্র আমাদের কালেও নতুন চেহারায়, আরো ভয়ঙ্করূপে দেখা দিয়েছে। ফ্যাসিজম্ ও কম্যুনিজম্— মৌমাছিতন্ত্রের এই দুটো আধুনিক রাজনৈতিক মতাদর্শের যুক্তিসিদ্ধ সমালোচনা করেছেন শিবনারায়ণ। তাঁর মতে ফ্যাসিজম্ ও কম্যুনিজম্ এই দুই মৌমাছিতন্ত্রেরই সূচনা রুশো এবং জার্মান দার্শনিক হেগেল থেকে। রুশো সমষ্টির ইচ্ছায় ব্রহ্মত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি বলেছেন— কোনো ব্যক্তি সমষ্টির নির্দেশ না মানতে চাইলে সমষ্টি তাকে জোর করে সে নির্দেশ মানাবে। সমষ্টিকে বলশালী করার প্রয়োজনে ব্যক্তির স্বাধিকার ও স্বাধীনতার উচ্ছেদ ঘটিয়ে তার চেতনায় এবং জীবনচর্চায় গোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যকে প্রশ্নাতীত করতে হবে। ফ্যাসিস্তদের কাছে রুশো-কল্পিত এই সমষ্টিসত্তা জাতিরূপে প্রতিভাত। ফ্যাসিস্ত মতাদর্শে জাতির প্রতিভূ জাতীয়-রাষ্ট্র। জাতীয় -রাষ্ট্রের নির্দেশ অমান্য করার অধিকার কোনো ব্যক্তি-মানুষের নেই। সে-ব্যক্তি কবি হতে পারেন, ভাবুক হতে পারেন, শিল্পী অথবা বিজ্ঞানী হতে পারেন। তার এক স্বতন্ত্র সৃষ্টির জগৎ, তাঁর জাতি-ধর্ম-সমাজ-নিরপেক্ষ এক দ্বিতীয় ভুবন থাকতে পারে। কিন্তু ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রে তাঁর কোনো মূল্য বা স্বীকৃতি নেই, যদি তাঁর জাতি ও রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তিত্ব-বিনাশী আনুগত্য না থাকে।

হেগেলও তাঁর ইতিহাসের দর্শন ব্যাখ্যায় বলেছেন যে প্রত্যেক জাতির একটি বিশিষ্ট আত্মা আছে। শিবনারায়ণ হেগেলের মতাদর্শ বিচার করে লিখেছেন, হেগেলের মতে— ''জাতির মধ্যে যে দেহবিশিষ্ট ব্যক্তির বাস আছে তাদের কর্তব্য হল আপন আপন জাতির সমষ্টিগত ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্র এবং অনিশ্চিত ব্যক্তিত্বকে মিলিয়ে দেওয়া। এই পথেই তাদের অস্তিত্বের চরিতার্থতা।'' মৌমাছিতন্ত্রের এই ভয়ংকর রূপটি যে শুধু রুশো-হেগেলের তত্ত্বচিন্তা নয়, তা যে আমাদের শতকে এই পৃথিবীতে সর্বগ্রাসী দানব হয়ে দেখা দিয়েছিল তার প্রমাণ তো মুসোলিনি, হিটলার, পেরন, সালাজার। 'মৌমাছিতন্ত্র' প্রবন্ধে রুশো-হেগেলের মতাদর্শ বিচারের পথেই শিবনারায়ণ স্বচ্ছন্দে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এসে দাঁড়াতে পেরেছেন। এবং স্রোতের বিরুদ্ধে দুঃসাহসের সঙ্গে লিখেছেন— ''ফ্যাসিজম্-এর যেটি মূল প্রত্যয়— অর্থাৎ জাতির সমষ্টিগত সত্তার মধ্যে বিলোপে ব্যক্তির মোক্ষ— প্রায় সূচনা থেকেই সেটি আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে পরিচালিত করে এসেছে। রুশোর অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে আমাদের এই মৌমাছিতন্ত্রে দীক্ষা দিলেন; তারপর বিবেকানন্দ, তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ মহর্ষিদের দিব্যজ্ঞানের সমর্থনে যে-মন্ত্র ক্রমে ভারতীয় শিক্ষিত মনে তার প্রবল মোহপাশ বিস্তার করল।'' বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তিনি একথা লিখতে দ্বিধাগ্রস্ত হন নি— ''গুরুবাদ এবং সমষ্টিবাদের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি এদেশে যে চিন্তাধারার প্রবর্তন করলেন তাই ক্রমে প্রবল হয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদরূপে অধিকাংশ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে।'' শিবনারায়ণের বিচার যে সৎ এবং নির্ভুল তা তো আজ তথ্য-সমর্থিত। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, তিলক সম্পর্কে এমন অপ্রিয় সত্যবাচন একালের আর কোনো বাঙালির লেখায় আছে কিনা আমি জানি না। আমার মনে হয়েছে, 'মৌমাছিতন্ত্র' প্রবন্ধে শিবনারায়ণের মুক্তবুদ্ধি মনন চিন্তনের ধারা মিশেছে রবীন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথের মহৎ মানুষী চেতনার সমুদ্র-মোহনায়। মোহানায় পৌঁছে তিনি পুনরায় মৌমাছিতন্ত্রের বিপরীত মেরুতে অধিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে ভোলেন না। তিনি লিখেছেন— ''এদেশের লোক ভক্তির মেঘ-ছোঁয়া বেদীর মাথায় কবিকে বসিয়েছে; তাঁর সতর্কবাণী তাঁদের কানে ঢোকে নি, অথবা ঢুকলেও তার মানে বোঝে নি। ফলে যদি দেশ আজ স্বাধীন, ব্যক্তি এবং বিচারবুদ্ধি দুই-ই আজ মুমূর্ষু।'' মৌমাছিতন্ত্রের অনিবার্য গতি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অপমৃত্যুর দিকেই।

মৌমাছিতন্ত্রের দ্বিতীয় সমকালীন রূপটি, শিবনারায়ণের মতে, কম্যুনিজম্। ফ্যাসিজম্-এর মৌমাছিতন্ত্র একেবারে নির্ভেজাল, পাথরের মতো নিরেট। কিন্তু কম্যুনিজম্ -এর মৌমাছিতন্ত্রের সঙ্গে মানবতন্ত্রের কিছুটা খাদ মেশানো ছিল। কম্যুনিস্টরাও বলেন, মানবতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই তাঁদের উদ্দেশ্য, কিন্তু উপায় হিসেবে মৌমাছিতন্ত্রে দীক্ষা উদাহরণ আছে। কম্যুনিস্ট মৌমাছিতন্ত্র কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির সাম্প্রতিক ভাঙন ও পতনের যে প্রধান কারণ, তা' আর অস্বীকার করার পথ নেই।

শিবনারায়ণ ব্রেখ্ট্ এবং প্রাক্তন কম্যুনিস্ট লেখক হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর কথা উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন কী প্রক্রিয়াতে ব্যক্তি-মানুষের মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়। ব্রেখ্ট্ -এর কথায় পার্টির সদস্যরা জপ করতে শেখে— ''তোমাদের এখন থেকে আর ব্যক্তিসত্তাবলে কিছু রইল না। তুমি এখন থেকে আর বার্লিনের কার্ল শ্মিট নও, তুমি নও কাজানের আনা কিয়েৰ্স্ক, তুমি নও মস্কোর পিটার সাভিচ্। এখন থেকে তোমাদের আর কোনো নাম বা মাতৃপরিচয় নেই; তোমরা শুধু সাদা পাতা যার ওপরে বিপ্লব তার হুকুম লেখে...।'' [You no longer are yourselves. No longer are you Karl Schmitt of Berlin. You are no longer Anna Kyersk of Kazan, and you no longer Peter Savich of Moscow. You are all without name or mother, blank leaflets on which the Revolution writes its orders... Bertold Bercth, Gesmmelte Werve,] [Die Massanahe (gta)] ফাস্ট তাঁর দ্য নেকেড্ গড বইতেও এই মৌমাছিতন্ত্রের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব বিনাশী অনাচারের বিবরণ লিখেছেন। তাঁর বিবরণ অনুসারে— পার্টি যখন ক্ষমতায় আসে তখন শুধু তার সদস্যদের নয়, রাষ্ট্রশক্তির উপরে নিরঙ্কুশ কর্তত্বের জোরে সমস্ত সমাজটাকেই সে মৌমাছিতন্ত্রের অঙ্গীভূত করে। শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস থেকে শুরু করে উৎপাদন বন্টন, নির্বাচন, শিক্ষা, সংস্কৃতির সবকিছুই তখন মৌমাছির এক একটি মৌচাক অথবা অরওয়েল-এর 'অ্যানিম্যাল ফার্ম'। শিবনারায়ণের ভাষায়— ''সে রাষ্ট্র থেকে প্রেম এবং সৃষ্টি নির্বাসিত; সেখানে স্বাধীনচিন্তা নিষিদ্ধ; সেখানে

বৈচিত্র্য অবলুপ্ত। সেখানে স্বাতন্ত্রের শাস্তি— দাসত্ব অথবা মৃত্যু।”

মানুষের যদি মস্তিষ্কের সামর্থ না থাকত, অন্যান্য প্রাণীর মতো শুধু পরিবেশ ও আদিম প্রবৃত্তি প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, তাহলে মৌমাছিতন্ত্রই আমাদের কাছে গ্রহণীয় রাষ্ট্রিক বা সামাজিক আদর্শ হয়ে উঠত। কিন্তু মস্তিষ্ক নামক আগুনের পরশমণিটিকে তো মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না। আবার এমনও তো হতে পারে না যে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে দলে দলে মানুষ মস্তিষ্কহীন হয়ে জন্ম নেবে। সুতরাং মস্তিষ্ক-সামর্থ্যের জোরেই যদি কতিপয় কর্তা-ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষের ঈজারদার হতে পারেন, মানুষ ও মনুষ্যত্বের এর চেয়ে ভয়ংকর বিপর্যয় আর কিছু হতে পারে না। আমাদের আশা ভরসার কথা এখানে—সোক্রাতিস-এর কাল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের এই পৃথিবীর দেশে দেশে এমন কিছু খাঁটি মানুষ জন্মেছেন যাঁরা কোনো মূল্যেই তাঁদের মস্তিষ্ককে কোনো কর্তার হাতেই ইজারা দিতে চান নি। মস্তিষ্ক-সামর্থ্যে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চা করেছেন, মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভাবনা-চিন্তার ঐশ্বর্যে বিকশিত করেছেন। কোনো প্রকারের মৌমাছিতন্ত্রেই মানুষের মস্তিষ্ক-সামর্থ্য সদর্থ ভূমিকায় তার অন্তর্লীন সম্ভাবনাকে এভাবে বিকশিত করতে পারে না।

দুঃখ ও ক্ষোভের কথা এই-জাতিবাদ, ফ্যাসিজম্ কম্যুনিজম্ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও মানবেন্দ্রনাথের সতর্কবাণী এদেশের সাধারণ মানুষ দূরের কথা, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের চিন্তা-চেতনাকেও প্রভাবিত করতে পারে নি। শিবরারায়ণ 'মৌমাছিতন্ত্র' প্রবন্ধে এই ক্ষোভ ব্যক্ত করে তাঁর মস্তিষ্ককে কোনো গুরু বা কর্তার কাছে ইজারা দেন নি, তাও প্রমাণ করেছেন।

'মৌমাছিতন্ত্র' প্রবন্ধের ভাবনা-স্রোতই প্রবাহিত হয়ে এসেছে পরের তিনটি প্রবন্ধে— 'উদারতন্ত্রের অবক্ষয়', 'গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি এবং চর্চা', 'রেনেসাঁস ও মানবতন্ত্র'-এ। উদারতন্ত্র, গণতন্ত্র ও মানবতন্ত্র, এই তিনটিই মৌমাছিতন্ত্রের প্রতিবাদী রাজনৈতিক দর্শন। সচেতনভাবেই শিবনারায়ণ মৌমাছিতন্ত্রের সর্বগ্রাসী ক্ষমতা-ক্ষুধার ভয়ংকর চরিত্রের কথা বলেই উদারতন্ত্র, গণতন্ত্র, মানবতন্ত্রের খোলামেলা বৃহৎ পরিসরে এসে পৌঁছেছেন।

শিবনারায়ণ বলেছেন, ‘‘আধুনিক সভ্যতার প্রবর্তন এবং বিকাশের মূলে যে সমাজ দর্শন তার নাম উদারতন্ত্র বা লিবর্যালিজম্ জীবন দর্শনের মূল প্রত্যয় হল ব্যক্তির বিকাশই সমাজের কল্যাণের উৎস এবং মানদণ্ড। ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের এই বকাশের জন্য দরকার স্বাধিকার স্বাধীনতা এবং জীবনচর্চায় যুক্তি প্রয়োগ। উদারতন্ত্রী ব্যবস্থায় কোনো একটি মতাদর্শ বা বিধানকে জোর করে সমাজের সব মানুষের মাথায় চাপানো হয় না। শিবনারায়ণ উদারতন্ত্রী চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল-এর মতামত বিচার করে দেখিয়েছেন যে, তিনটি কারণে সমাজে চিন্তা এবং মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার। প্রথমত, মত ও নানা বিরুদ্ধ-মতের সহবাসে সংঘাতে অথবা সহযোগে সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; দ্বিতীয়ত, একজনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় সত্যোপলব্ধি অসম্পূর্ণ থাকতে পারে বহুজনের বিভিন্ন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত সিদ্ধান্তের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যে সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে, তা অনেকটা নির্ভুল হওয়া সম্ভভ। তৃতীয়ত, কোনো প্রচলিত ধারণা যদি সত্যও হয়, তবু বিরোধী মতের স্বীকৃতির অভাবে তা এক সময়ে অন্ধ সংস্কারে পরিণত হয় এবং মনে জড়তা আনে।

উদারতন্ত্রীর দৃষ্টিতে প্রতি ব্যক্তি অনন্য এবং সে কারণে সমান মূল্যবান। প্রতি ব্যক্তিই অন্তর্লীন শক্তির বিকাশের সহজ ও স্বাধীন পথ পেলেন সৃজন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। উদারতন্ত্রের এই ব্যক্তিসত্তার আর কোনো পরিচয় নেই, জাতি-ধর্ম-বর্ণ দিয়ে তা চেনা যায় না, সে শুধু মানুষ সে 'প্রভুহীন মানুষ', কর্তার ইচ্ছায় সে কর্ম করে না। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে শিবনারায়ণ তাঁর ব্যাপক অধ্যয়ন এবং গভীর অন্বেষণে বিশ্বের উদারতন্ত্রী মনীষীদের ভাবনা চিন্তার সারাংশ এই প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন। জি. এইচ. স্যাবাইন-এর — 'মানুষের স্বাধীনতাস্পৃহা, যুক্তিশীলতা ও সৃজনধর্ম'; বুর্কহার্ট-এর— 'একক মানুষের অনন্য-মানুষে বিকশিত হওয়াতেই ব্যক্তির সার্থকতা'; ক্যাসিরার -এর— 'রেনেসাঁস-প্রসূত নতুন জীবন-চেতনার ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা'; সালভাদোরির— 'মানুষের মনে ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্য সম্বন্ধে চেতনায় উন্মেষ, উদ্দেশ্য ও উপায়ের সমান নৈতিক ভিত্তির গুরুত্ব', ইত্যাদি উদারতন্ত্রের প্রধান প্রধান প্রত্যয়ের উল্লেখন প্রবন্ধটিকে বৈদগ্ধ্য-মার্জিত করেছে।

উদারতন্ত্রের অবক্ষয়ে কারণ নির্ণয় শিবনারায়ণ দেখিয়েছেন, উদারতন্ত্রের সর্বজনীন প্রত্যয় সব মানুষের মধ্যে মুক্তিস্পৃহা এবং যুক্তিশীলতার বিকাশ— যে-সমাজ অনুশীলিত হয়েছে, সে-সমাজে উদারতন্ত্র পরিণতি পেয়েছে লিবার্যাল গণতন্ত্রে। কিন্তু যে-সমাজে বুর্জোয়াশ্রেণী উদারতন্ত্রের এই প্রত্যয়কে উপেক্ষা করেছে, জনসাধারণের প্রতিবাদের চাপে বুর্জোয়াশ্রেণী উদারতন্ত্রের এই প্রত্যয়কে উপেক্ষা করেছে, জনসাধারণের প্রতিবাদের চাপে বুর্জোয়ারা ক্রমেই উদারতন্ত্রবিরোধী হয়ে উঠে জুলুমতন্ত্রের জোরে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করতে চেয়েছে। কালক্রমে বণিক ও ধনিক শ্রেণীর দূর্ণীতিপরায়ণতায়, তাদের দুরন্ত লোভে ও ক্ষমতা-স্পৃহায় উদারতন্ত্র মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমার বুঝতে পারি, ইংল্যান্ডের সমাজে উদারতন্ত্রের অনুধাবনে ও অনুসরণে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের (প্রাতিষ্ঠানিক রাজতন্ত্রকে রক্ষা করেও) ভিত্তি দৃঢ় হয়েছে। অন্যদিকে ফ্রান্সে উদারতন্ত্রের আদর্শকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করে ভলতেয়ারের যুক্তিবাদী মননশীলতাকে অসম্মানিত করে কর্তাব্যক্তিরা বিদ্রোহ, বিক্ষোভের আগুন জালিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' গড়ে তুলেছেন। এভাবেই ফ্রান্সে উদারতন্ত্রের ধারা দীর্ঘকালের জন্য বিলুপ্ত হল। ভারতবর্ষেও এক সময়ে বাঙালি মনীষায় যে উদারতন্ত্রী

প্রতিন্যাস দেখা দিয়েছিল, জাতির সমষ্টিসত্তার আগ্রাসনে তা ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়। জাতি, ধর্ম, যতটা মূল্য পেল, মানুষ সে মূল্য পেল না।

পরবর্তী দুটি প্রবন্ধে— 'গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি' এবং 'চাচ', রেনেসাঁস ও মানবতন্ত্রে'র শিবনারায়ণের রাজনৈতিক দৃষ্টি একটি সম্পূর্ণ বৃত্তে উত্তীর্ণ। গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনি বলেছেন— সংস্কৃতির মুক্ত আলো-বাতাসেই গণতন্ত্র সজীবতা পায়। গণতন্ত্রের ভিত্তি দল নয়, দলের ক্ষমতাও নয়, ব্যক্তি-মানুষের স্বাধিকার ও স্বাধীনতাবোধ। এই বোধ গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক রূপান্তরের পথে— অবিরাম নতুন নতুন ভাবনা - চিন্তার অভিঘাতে।

ইওরোপে চার্চ এবং এদেশে মন্দির মসজিদ মানুষকে আচার অনুষ্ঠানে, শাস্ত্রীয় বিধিবিধানে বেঁধে রেখেছিল। চার্চের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ইওরোপের রেনেসাঁস মানব-মহিমা প্রতিষ্ঠিত করল। এক অর্থে রেনেসাঁসের অবদান যে-কোনো রাজনৈতিক বিপ্লবের চেয়ে মহত্তর এবং এই অবদানের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর। রেনেসাঁস বিচিত্র সৃজন ক্ষমতায় ও আকাঙ্ক্ষায় মানুষকে তার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতেন করে তুলল। সে এই প্রত্যয়ে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলতে পারল— সেই নিজেই তার স্রষ্টা, কোনো শক্তির কাছে অনুগত না হয়েও সে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মানবতন্ত্রের এই প্রধান প্রত্যয়টি মৌমাছিতন্ত্রের প্রবল প্রতিবাদী শক্তি। শিবনারায়ণের রাজনৈতিক চেতনায় এই প্রত্যয়টি এত দৃঢ়মূল্য যে মানবতন্ত্রী জীবনচর্যার একেই তিনি মূলধন করেছেন।

এই মানবতন্ত্রী প্রত্যেয়ের মূলধন তাঁর জীবনের শেষ পর্বে একটি মহৎ সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত হয়েছে। তাঁর মনীষাদৃপ্ত রাজনীতি-জিজ্ঞাসার শেষ এবং সুপরিণত উত্তর তিনি দিয়েছেন বিপ্লবী দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায়ে জীবনব্যাপী স্বাধীনতা - অন্বেষার দীর্ঘ ইতিবৃত্ত রচনা করে। চার খণ্ডে রচিত (চতুর্থ খণ্ডের দুটি অংশ আছে) In Freedom's Quest: Life of M. N. Roy শিরোনামে এই মহাগ্রন্থে তিনি মানবেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী পর্ব থেকে মৌল মানবতাবাদী পর্বে উত্তরণের তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ একটি মহামূল্যবান অবদান রাজনীতি চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে রেখে গেছেন। এই মহাগ্রন্থের গবেষণা মূল্য অতুলনীয়। তাঁর মুক্তবুদ্ধি মেধা-খরশাণ দৃষ্টির আলোকসম্পাতে মানবেন্দ্রনাথের জীবনে বিচিত্র কর্মোদ্যম ও মনস্বিতার অজানা তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতি চর্চার জগতে এই মহাগ্রন্থটি একটি ধ্রুপদী সৃষ্টিরূপে নিশ্চয় সমাদৃত হবে। শিবনারায়ণ তাঁর নিজের এবং যে-কোনো ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতার প্রত্যয়কে মানবেন্দ্রনাথের জীবনে ও বৈপ্লবিক দর্শনে সত্যার্থেই রূপায়িত হতে দেখেছেন।